অ্যানিমেল ফার্ম

Animal Farm

George Orwell

অ্যানিমেল ফার্ম

জর্জ অরওয়েল

অনুবাদ

রঞ্জনা ব্যানার্জী

KOBI PROKASHANI

অ্যানিমেল ফার্ম
জর্জ অরওয়েল
অনুবাদ : রঞ্জনা ব্যানার্জী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Animal Farm by George Orwell Translated by Ranjana Banerjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99576-1-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

গল্পপাঠ অনুবাদ টিম

অনুবাদকের কথা

১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশের পরের বছরই *অ্যানিমেল ফার্ম* বইটি পোলিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এর পরে প্রায় সত্তরটি ভাষার পাঠক এই বই পড়েছেন। এমনকি একই ভাষায় বইটির একাধিক অনুবাদও হয়েছে। এক বছর আগে এই কাজটি হাতে নিয়ে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ জেনেছিলাম বাংলাদেশে ইতোমধ্যে এর একাধিক অনুবাদ হয়ে গেছে। তবে এখন আবার কেন? দুমাস আগে এই বই অনুবাদের প্রস্তাব পাওয়ার পরে গল্পকার এবং অনুবাদক কুলদা রায়কে ফের এই প্রশ্নটিই করেছিলাম আমিও। তিনি বলেছিলেন, এই বইটির আবেদন এমনই যে পুনঃপাঠে এর দীপ্তি খোলে এবং এই বই প্রতিনিয়ত নতুন পাঠক টানে। ভেবে দেখলাম কথা সত্য। জর্জ অরওয়েলের এই বইটি আমি একাধিকবার পড়েছি এবং প্রতিবারই আচ্ছন্ন হয়েছি এবং প্রতিবারই নতুন করে ভেবেছি। কিন্তু প্রতিবারই যা পাল্টায়নি তা হলো বক্সারের জন্য আমার বেদনা। অনুবাদকালেও বক্সারের বিদায় দৃশ্যটি লিখতে গিয়ে সজল হয়েছি। এবং বিরতি নিয়েছি।

আমি লেখকের চেয়ে নিজেকে পাঠক ভাবতে বেশি ভালোবাসি। নিষ্ঠ পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, জর্জ অরওয়েলের এই নভেলার ভাষার সহজতা পাঠককে ঘন হয়ে বসতে ডাকে। পাঠক হিসেবে অরওয়েলের এই বুনন-শৈলীর আমি ভক্ত। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে', অথচ এই বইয়ে অরওয়েল রূপকের মোড়কে, অসীম দক্ষতায়, সহজ ভাষায়, শাসক-শোষিতের জটিল রসায়নটি পাঠকের কাছে অবলীলায় তুলে ধরেছেন।

আমি এই অনুবাদটির বেলায়, মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি তবে আখ্যানের মেজাজকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশি এবং জর্জ অরওয়েলের ভাষার সহজ চলনটি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি।

বইটির দারুণ সম্পাদকীয় লিখেছেন অধ্যাপক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞান লেখক শ্রদ্ধেয় দীপেন ভট্টাচার্য; এ আমার পরম প্রাপ্তি। এ ছাড়াও বইটিকে মূলের ঘনিষ্ঠ রাখার জন্য তাঁর নানা পরামর্শ আমাকে ভাবতে শিখিয়েছে এবং বইটিকে ঋদ্ধ করেছে।

গল্পপাঠের সুহৃদ লেখকদের কারণেই আমার অনুবাদ সাহিত্যে আসা। কেবলমাত্র একটি গল্প অনুবাদের অনুরোধের ঢেঁকি গিলেছিলাম, কিন্তু প্রায় এক ডজন বা তার চেয়েও বেশি গল্প আমি অনুবাদ করে ফেলেছি—নিজের অজান্তে। এবং অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক অচেনা ভিনদেশি লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ঋদ্ধ হয়েছি, গল্প বলার নানা শৈলী শিখেছি। আমার এই অনুবাদগ্রন্থটি গল্পপাঠ অনুবাদ টিমকে উৎসর্গ করে ভালোবাসার খানিক দায় মিটালাম।

এই বইয়ের প্রকাশক সজল আহমেদ বয়সে নবীন, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সজলের সংস্থা 'কবি প্রকাশনী'র ব্যানারে এটি আমার দ্বিতীয় কাজ। প্রথম বইটি ছিল একটি অনুবাদ সংকলন, যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। সেই বইটি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে করেছিলেন সজল। আমি নিশ্চিত *অ্যানিমেল ফার্ম*-এর বেলায়ও পাঠক আমার বয়ানের সত্যতা অনুভব করবেন এবং বইটি পাঠকের কদর পাবে।

শুভপাঠ।

রঞ্জনা ব্যানার্জী
প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড
কানাডা।
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

ভূমিকা

এরিক আর্থার ব্লেয়ার ১৯৩৩ সালে তাঁর প্রথম বই Down and Out in Paris and London প্রকাশ করতে গিয়ে একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন—জর্জ অরওয়েল। বইটি তাঁর নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা, প্যারিসে নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের মতো কাজ করা কিংবা লন্ডনে গৃহহীনদের সঙ্গে রাস্তায় রাত কাটানো। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের দুর্দশা সরাসরি অনুভব করতে, এই ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য জীবনের লিপি, তিনি তাঁর পারিবারিক নামে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এ ছাড়া, হয়তো ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যিক পরিচয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য রাখতে চেয়েছিলেন। সহজে গ্রহণযোগ্য নাম হিসেবে বাছলেন 'জর্জ', আর পদবি হিসেবে নিলেন 'অরওয়েল'—ইংল্যান্ডের পুব দিকে অবস্থিত, তাঁর পছন্দের Orwell নদীর নাম থেকে। যদিও তিনি এই নতুন পরিচয়ের মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্যিক জীবন গড়ে তোলেন, তাঁর আনুষ্ঠানিক নাম (যেমন পাসপোর্টে) আমৃত্যু কিন্তু এরিক আর্থার ব্লেয়ারই ছিল। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ রাশিয়ার লেনা নদী থেকে তাঁর নতুন পদবি লেনিন নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, জর্জ অরওয়েল কি সেই ইতিহাস জানতেন?

কিন্তু ইতিহাস থেকে জর্জ অরওয়েল এই শিক্ষা নিয়েছিলেন যে, ব্যর্থ বিপ্লব এই স্লোগানটির জন্ম দিতে পারে—'সব পশু সমান, তবে কেউ কেউ অধিকতর সমান।' অধিকারের সমতার অঙ্গীকার দিয়ে, সেটি শঠতায় কেড়ে নেবার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে 'অ্যানিমেল ফার্মের' এই উক্তিটি আজ আমাদের মস্তিষ্কে প্রোথিত। সেই 'অধিকতর সমান' পশুদের যে সবসময় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হতে হবে তা নয়, সমাজের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণিটিরও তারা প্রতিভূ হতে পারে। তাই 'অ্যানিমেল ফার্ম' শুধু একটি কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট দুর্নীতিগ্রস্থ একনায়কতন্ত্রের বর্ণনা নয়, একটি

কেন্দ্রীভূত পুঁজিগোষ্ঠীর সমালোচনাও বটে। এই বইটির আবেদন ও মূল্য, বিশেষত পৃথিবীর প্রতিটি ক্রান্তিকালে, একই সাথে কালোত্তীর্ণ এবং আন্তর্জাতিক। তাই, বর্তমান বিশ্বের অনিশ্চয়তায়, সুলেখক রঞ্জনা ব্যানার্জীর দক্ষ কলমে, বাংলা ভাষায় এর রূপান্তর আমাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়—বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি আর পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসের বিপর্যয় বা বিশ্বাসঘাতকতা যেন হাত মিলিয়ে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি সমালোচক জ্যাঁ-বাতিস্ত আলফোন্স কার লিখেছিলেন, 'যতই আমরা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই, ততই সবকিছু যেন অপরিবর্তিত থেকে যায়।' সাম্যের বাণী নিয়ে পশুরা অত্যাচারী মানুষদের হটিয়েছিল; কিন্তু সুযোগসন্ধানী শুয়োরেরা, খুব সহজেই, ভাষার রাজনীতি আর মিথ্যা প্রোপাগান্ডায়, বিশ্বাসপ্রবণ শ্রমিক পশুদের বিভ্রান্ত করে, নিজেদের 'অধিকতর সমান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আলফোন্স কারের ভাষায়, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই অপরিবর্তিত থেকে যায়।

সাহিত্য অনুবাদ শুধুমাত্র ভাষান্তরের প্রক্রিয়া নয়, এটি এক ধরনের শৈল্পিক ব্যাখ্যা, যেখানে মূল রচনার ভাব—শৈলী ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অক্ষুণ্ন রেখে—অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। অবশ্য সেটা করতে গিয়ে অনুবাদক বিভিন্ন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে পারেন, যেমন কখনো শব্দগত মিল বজায় রাখতে চাওয়া, আবার কখনো ভাবগত অর্থকে গুরুত্ব দেওয়া। পাঠকের সুবিধার্থে কোনো অনুবাদক স্থানীয় ভাষার উপযোগী করে অনুবাদ করেন, আবার কেউ কেউ মূল ভাষার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে চান। সুতরাং, সাহিত্য অনুবাদ নিছক ভাষান্তর নয়, এটি এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে চিন্তা ও অনুভূতির সেতুবন্ধ রচনার একটি সৃজনশীল মাধ্যম। এই তত্ত্বগুলোর বেশ কঠিন নাম আছে, সেগুলো উল্লেখ না করে বলব, রঞ্জনা ব্যানার্জী সেই ধারণাগুলোর এক চমৎকার মেলবন্ধন করেছেন যার ফলে অরওয়েলের স্বকীয়তা এবং তাঁর ভাষার অন্তর্নিহিত (সরল) সৌন্দর্য এই অনুবাদটিতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই চমৎকার অনুবাদটির যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হলে আমার মনে হয় জর্জ অরওয়েল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। অরওয়েল বেঁচেছিলেন মাত্র ৪৬ বছর, বেঁচেছিলেন এমন এক সময়ে যখন পৃথিবীর মানুষ এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সেই পরিবর্তনে আলফোন্স কারের

উক্তিটির সত্যতা অনুধাবন করেছিলেন তিনি। তবুও বিংশ শতাব্দীর রূপান্তরের নির্বাক সাক্ষী হয়ে থাকতে চাননি, ইতিহাসের চাকার ঘূর্ণনের অংশ হতে চেয়েছিলেন। আদিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অংশ হয়েও সেটির অন্যায্যতা বুঝতে পেরেছিলেন, স্বপ্রণোদিত হয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর গণতন্ত্রবিরোধী অক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, আবার সমসাময়িক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্তালিনের একনায়কতন্ত্রে ব্যথিত হয়েছিলেন। একটি মানুষ যখন ইতিহাস নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে চায় সে হয়ে ওঠে জীবনের চাইতে বড়, তার পদচিহ্ন হয় সুদূরপ্রসারী। সেই পদচিহ্নের গভীরতায় নির্মিত তাঁর দুটি উপন্যাস—'অ্যানিমেল ফার্ম' এবং '১৯৮৪'—এতগুলো বছর পার হয়ে যাবার পরও, কেমন করে আমাদের বর্তমানকে বর্ণনা করে তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

'অ্যানিমেল ফার্ম' তাই শত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত (আবার আলফোন্স কার!)। বিপ্লবের মাধ্যমে জোন্সের 'ম্যানর ফার্মের' অধিকার নিয়েছিল পশুরা, কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হলো না—সেটা বহিশত্রুর ষড়যন্ত্রের জন্য নয়—বরং তাদের নেতাদের ক্ষমতার লোভ ও সেই লোভের বিরুদ্ধে সাধারণ পশুদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য। শুয়োরদের বর্ষীয়ান নেতা ওল্ড মেজরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মানুষকে উৎখাত করে, সমতা ও স্বাধীনতার নতুন যুগ শুরু করার উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। সেটি হলো ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে, শুয়োরদের অন্য পশুদের শোষণ করার মাধ্যমে। অরওয়েল এই ধারণাটিই প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, যদি কোনো নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা না থাকে, তবে বিপ্লবগুলো একটি শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীকে আরেকটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে। ক্ষমতার দুর্নীতিতে, শুয়োর নেপোলিয়ন, ছলেবলে কৌশলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্নোবলকে খামার ছাড়া করল, আর নেপোলিয়নের সাফাই গাইল শুয়োর স্কুইলার। অবলীলায় মিথ্যা বা আংশিক সত্য বলে এবং সরাসরি ভয় দেখিয়ে স্কুইলার অন্য পশুদের নেপোলিয়নের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করে। এটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, প্রোপাগান্ডার ভূমিকা এবং ভাষার সুবিধাবাদী ব্যবহার জনগণকে কীভাবে ধোঁকা দিতে পারে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। নাম উল্লেখ না করলেও আমরা বুঝতে পারি এখানে ওল্ড মেজর হলো কার্ল মার্কস অথবা লেনিন, নেপোলিয়ন হলো স্তালিন আর স্নোবল ট্রটস্কি।

কিন্তু একই সাথে গল্পটি শোষিত জনগণের উদ্যোগহীনতাকে এই পরিণতির জন্য আংশিকভাবে দায়ী করে। বক্সার নামে একটি ঘোড়া অক্লান্ত পরিশ্রম করে খামারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছিল। এখানে বক্সার হলো শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতীক, সে ক্ষমতার প্রোপাগান্ডাকে বিশ্বাস করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই অন্ধ আনুগত্যই তার ট্র্যাজেডির কারণ হয়ে উঠেছে। অরওয়েল বলতে চেয়েছেন, নিষ্ক্রিয়তা ও অন্ধ বিশ্বাস দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের আরও শক্তিশালী করে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সন্তান হয়েও অরওয়েল সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন, উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সমাজতন্ত্রী ছিলেন। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর জন্য হঠাৎ করে উদয় হয়নি। অরওয়েলের পরিবার মধ্যবিত্ত ছিল, তবে আর্থিকভাবে বিশেষ সচ্ছল ছিল না। তাঁর বাবা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনে কাজ করতেন। অরওয়েলের জন্ম হয় বিহারে, ১৯০৩ সালে। জন্মের এক বছরের মধ্যেই মা অরওয়েলকে নিয়ে বিলেত চলে যান। বিখ্যাত ইটন কলেজে পড়াশোনা শেষ করার পর, ১৯২২ সালে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশে যোগ দেন এবং বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) পাঁচ বছর কাজ করেন। ভারতে অরওয়েল আর ফিরে যাননি, সেই অর্থে জন্মগ্রহণ করা ছাড়া ভারতের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অল্প সময়ের জন্য তিনি বিবিসির ভারত বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

তরুণ অরওয়েল বার্মায় থাকার সময়ের একটি ঘটনা, Shooting an Elephant নামে একটি গল্পে, সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক দ্বন্দ্বটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। গল্পটিতে অরওয়েল ছিলেন উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতীক, সেই হিসেবে হাতিটিকে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর হত্যা করতে হয়, জনসম্মুখে নিজের অবস্থান ও শক্তি দেখানোর জন্য। এই অযৌক্তিক কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ শাসক এবং শাসিত উভয়ের জন্যই একটি ধ্বংসাত্মক চক্র হয়ে ওঠে।

বিলেতে ফিরে অরওয়েল তাঁর বার্মার অভিজ্ঞতা ভুলে যাননি। সেজন্য মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, লুম্পেন জনগণ কীভাবে থাকে সেটা দেখতে তাদের জীবনের সাথে মিশেছেন, বস্তিতে বাস করেছেন, রেস্তোরাঁয় থালাবাসন ধোয়ার কাজ করেছেন, মাঝেমধ্যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন

কাটিয়েছেন। সমাজে আর্থিক বৈষম্য দেখে তাঁর মধ্যে একটা পুঁজিবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত, তাঁর The Road to Wigan Pier নামে বইটিতে, তিনি একদিকে যেমন কয়লা শ্রমিকদের জীবন, তাদের নিম্নমানের বাসস্থান এবং অর্থনৈতিক সংকটের ভয়াবহ প্রভাব বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপনা করেছেন, লিখেছেন 'We have got to fight for justice and liberty, and Socialism does mean justice and liberty when the nonsense is stripped off it.'

১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। হিটলারের সমর্থনপুষ্ট ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সঙ্গে স্পেনের বামপন্থী গণতান্ত্রিক রিপাবলিকান সরকারের লড়াই। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই, শুধু বামপন্থী নয় সচেতন মধ্যপন্থীরা, সেই সময় রিপাবলিকান সরকারের হয়ে যুদ্ধ করতে স্পেনে আসেন। এই যুদ্ধে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পেনের কমিউনিস্টদের অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দেয়। কিন্তু সেই সময় কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভাজন ছিল; ১৯৩৭-এর জানুয়ারিতে অরওয়েল একটি কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন, কিন্তু খুব শিগগিরই কমিউনিস্ট দলগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে হতাশ করে। ওই বছরের মাঝামাঝি তিনি যুদ্ধে আহত হন, একটি গুলি তাঁর কণ্ঠনালিকে ছেদ করে। অরওয়েল যে মার্কসবাদী দলের হয়ে যুদ্ধ করছিলেন সেটিকে সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্টরা একই সাথে ট্রটস্কিপন্থী এবং ফ্যাসিস্ট বলে আখ্যায়িত করে। আহত অবস্থায় স্পেন ত্যাগ করলেও অরওয়েলকে তাঁর অনুপস্থিতেই ফ্রাঙ্কোর চর বলে বিচার করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কো জয়ী হয়। স্পেনে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে Homage to Catalonia (১৯৩৮) বইটিতে অরওয়েল লিখেছিলেন—'এটি সত্য যে, ফ্যাসিস্টরা আমাদের তুলনায় আরও ভালোভাবে সশস্ত্র ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্প্যানিশ শ্রমিক শ্রেণিকে পরাজিত করেছিল ফ্যাসিস্টরা নয়, তাদের নিজেদের নেতাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতাই এই পরাজয়ের মূল কারণ ছিল।'

স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ চলাকালীন মস্কোতে জোসেফ স্তালিন তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী লিওন ট্রটস্কির শেষ প্রভাবটি মুছে ফেলতে, প্রহসনমূলক বিচারে,

হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। এর মধ্যে ছিলেন তাঁর ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা। যেমন নিকোলাই বুখারিন, লেভ কামেনেভ, গ্রিগোরি জিনোভিয়েভ প্রমুখ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই এই খবরগুলো পশ্চিমে পৌঁছাতে শুরু করে। অরওয়েল এই প্রক্রিয়ারই এক প্রতিফলন স্পেনে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর স্প্যানিশ অভিজ্ঞতা ও মস্কো বিচারের ঘটনাটি মিলিয়ে তিনি 'অ্যানিমেল ফার্ম' লেখার প্রস্তুতি নেন। তাই বইটিতে, ট্রটস্কির প্রতিভূ স্নোবল নামের শুয়োরটিকে স্তালিনের প্রতিভূ নেপোলিয়ন শুধু খামার থেকে তাড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, স্নোবলের সমস্ত অবদানকে স্মৃতি থেকে মুছে দিতে তৎপর হয়েছিল। অন্য পশুদের নিষ্ক্রিয়তায় এই প্রক্রিয়ায় সে সফল হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই সময় বহু সমাজতন্ত্রীই স্তালিনের কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার স্পেনের গৃহযুদ্ধে রিপাবলিকানদের হয়ে লড়েছিলেন। এঁর মধ্যে একজন ছিলেন আর্থার কোয়েস্টলার যার Darkness at Noon (১৯৪০) একটি অনামা দেশে, প্রতীকীভাবে বুখারিন বা কামেনেভ, এরকম কারুর, প্রহসন বিচার দেখিয়েছিল। অরওয়েলের মতোই কোয়েস্টলার একই সাথে জার্মান ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে আহত হবার ফলে অরওয়েল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিতে পারলেন না। প্রথমে বিলেতের হোমগার্ড ও পরে বিবিসিতে যোগ দিলেন। এই সময়ে 'অ্যানিমেল ফার্ম' লিখলেন, কিন্তু কোনো প্রকাশনা সংস্থা বইটা ছাপাতে রাজি হচ্ছিল না, পাছে এতে যদি তখনকার মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন চটে যায়। প্রায় বছরখানেক লাগল প্রকাশক পেতে, ততদিনে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধের পরে মনে হয় পশ্চিম ইউরোপের মানুষ বইটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। 'অ্যানিমেল ফার্ম' ব্যবসায়িকভাবে সফল হলো।

এরপরে স্পেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানিতে একনায়কতন্ত্রের ভূমিকা, প্রোপাগান্ডা ও দমননীতি এবং যুদ্ধপরবর্তী ব্রিটেনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতন্ত্রের প্রসারের প্রেক্ষাপটে অরওয়েল লিখলেন ১৯৮৪ (১৯৪৯ সালে প্রকাশিত)। এটি একটি ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস, যেখানে 'বিগ ব্রাদার' নামে পরিচিত সর্বক্ষমতাশালী শাসকের নেতৃত্বে তার পার্টি পুরো সমাজকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উইনস্টন স্মিথ 'সত্য

মন্ত্রণালয়ে' কাজ করে, যেখানে ইতিহাসকে সরকারের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা হয়। স্মিথ গোপনে পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চিন্তা লালন করে এবং জুলিয়া নামের এক নারীর সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু রাষ্ট্রের চিন্তা-পুলিশ (Thought Police) তাদেরকে ধরে ফেলে। নির্মম নির্যাতনে স্মিথের মনোবল ভেঙে যায় এবং সে বিগ ব্রাদারকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সামনে ব্যক্তিস্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। ১৯৮৪-কে ধরা হয় আধুনিক যুগের গণনজরদারি ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রতিবাদ।

১৯৪৫ সালে, অরওয়েলের স্ত্রী একটি সাধারণ হিস্টেরেকটমি অপারেশনের সময় আকস্মিকভাবে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যু অরওয়েলের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘদিন যক্ষ্মায় ভুগেছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর স্কটল্যান্ডের জুরা দ্বীপে একাকী কাটান। সেখানেই তিনি ১৯৪৮ সালে '১৯৮৪' সম্পূর্ণ করেন। অনেকে বলেন ঐ উপন্যাসটির গম্ভীর ও নিরাশাবাদী পরিবেশ কিছুটা তাঁর শারীরিক ও মানসিক সংগ্রামেরও প্রতিফলন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে, মাত্র ৪৬ বছর বয়সে, অরওয়েল লন্ডনের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৬ সালে, অরওয়েল 'কেন লিখি' নামের একটি প্রবন্ধে, লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রথমেই মানুষের নিছক আত্মগরিমার (egoism) কথা উল্লেখ করেছেন—মানুষ লেখে নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে অথবা মৃত্যুর পরে স্মরণীয় হয়ে থাকতে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, বাইরের পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং সাহিত্য সৃজনে সঠিক শব্দের সঠিক বিন্যাসের নান্দনিক আবেগে আনন্দ পাওয়া। শুধুমাত্র তার পরই, তৃতীয় উৎস হিসেবে, ঐতিহাসিক প্রেরণাকে চিহ্নিত করেছিলেন—বাস্তবতাকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেটি রেখে যাওয়া, আর একদম শেষে উল্লেখ করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা—সাহিত্যে সেই সমাজের উপস্থাপনা যেটি মানুষের জন্য দরকার। তাঁর মতে কোনো সৃষ্টিই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত নয়। ঐ প্রবন্ধটির শেষে অরওয়েল লিখেছিলেন—'সব লেখকই কিছুটা অহংকারী, স্বার্থপর এবং অলস, তবে তাদের লেখার গভীরে এক রহস্য লুকিয়ে থাকে। একটি বই লেখার প্রক্রিয়া হলো এক দীর্ঘ, যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থতার মতো এক ক্লান্তিকর সংগ্রাম।...তবুও, এটাও সত্য যে, কেউ

কখনো পাঠযোগ্য কিছু লিখতে পারে না, যদি সে নিজের ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম না করে।...নিজের কাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখি, যখনই আমার লেখায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অভাব ছিল, তখনই আমার লেখা প্রাণহীন হয়ে পড়েছে এবং আমি অতিরঞ্জিত অলংকারপূর্ণ বাক্য, অর্থহীন শব্দগুচ্ছ, সাজানো বিশেষণ এবং নিরর্থক কথার ফাঁদে আটকে গিয়েছি।' এখানে এটা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অরওয়েলের অরাজনৈতিক বহু লেখা আছে যা পাঠকেরা হয়তো অর্থহীন শব্দগুচ্ছ মনে করে না (যেমন চায়ের প্রতি ভালোবাসায় লেখা A Nice Cup of Tea)।

পরবর্তীকালের বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন জর্জ অরওয়েলকে পথভ্রষ্ট প্রাক্তন কমিউনিস্ট এবং পশ্চিমা চর হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। বলাই বাহুল্য তাঁর বইগুলো দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে গণ্য করতেন, তাঁর সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল সূক্ষ্ম ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর নির্মিত। সময় পেরিয়ে জর্জ অরওয়েলের বার্তা হলো, সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা, প্রোপাগান্ডা ও ক্ষমতার অপব্যবহার মানব স্বাধীনতা ও সত্যকে ধ্বংস করে। তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের দেখায় কীভাবে সহজে সত্যকে বিকৃত করা যায়, ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নজরদারির মাধ্যমে জনগণকে দমন করা যায়। তাঁর লেখা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার রক্ষার বার্তা। অরওয়েলের গদ্য সরল, এটি তাঁর সাংবাদিকতা পেশা থেকে অর্জন। রঞ্জনা ব্যানার্জী সেই সারল্যকে ধরতে পেরেছেন এবং অরওয়েলের মূল রূপটি বজায় রেখেছেন। সব অনুবাদক সেটি করতে পারেন না। আজকের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলা ভাষায় 'অ্যানিমেল ফার্ম'-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

দীপেন ভট্টাচার্য
ক্যালিফোর্নিয়া
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

১

সেই রাতে ম্যানর ফার্মের মালিক মি. জোন্স মুরগির খোপগুলো আটকালেন বটে, কিন্তু তিনি এতটাই মাতাল ছিলেন যে ঘুলঘুলির ঝাপ টানার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। শরীরের ভার এক পাশে হেলিয়ে টলোমলো পায়ে তিনি উঠোন পেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। তাঁর হাতের লণ্ঠনের আলোটিও এদিক-ওদিক দুলে দুলে চলছিল তাঁর সঙ্গে। খিড়কি দুয়ারের কাছে পৌঁছেই পায়ের বুটজোড়া ছুড়ে ফেললেন তিনি। এরপরে রসুইঘরের লাগোয়া ধোলাই ঘরে রাখা বিয়ারের পিপে থেকে দিনের শেষ গেলাসটি ভরলেন এবং শোবার ঘরের দিকে এগোলেন। মিসেস জোন্স ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শোবার ঘর থেকে তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে।

জোন্সের ঘরের বাতি নিভতেই খামারবাড়ির ভেতর হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। ঘটনা হলো, আজ দিনভর খামারজুড়ে একটা কথাই ঘুরছিল : বুড়ো মেজর আগের রাতে কী এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছেন যা নিয়ে খামারের সবার সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান। বুড়ো মেজর হলো এই খামারের পুরস্কার জেতা 'মিডল হোয়াইট' প্রজাতির প্রবীণ শুয়োর। স্থির হয়েছিল মি. জোন্স নিরাপদ দূরত্বে সরা মাত্রই সবাই গোলাঘরে জমা হবে। বুড়ো মেজর (এই নামে পরিচিত হলেও প্রদর্শনীতে কিন্তু তাঁকে 'উইলিংডন সুন্দরী' নামে উপস্থাপন করা হয়েছিল) খামারবাসীদের কাছে পরম শ্রদ্ধার জন। তাই তাঁর কথা শোনার জন্য একঘণ্টা ঘুম বরবাদ করতে কারুরই কোনো আপত্তি ছিল না।

বিশাল গোলাঘরের এক কোণে, কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো লণ্ঠনটির নিচে, ডাঁই করে রাখা খড়ের গাদা বেশ উঁচু এক মঞ্চের মতো আকৃতি পেয়েছে। তার ওপরেই ইতোমধ্যে মেজর জুত করে আসন নিয়েছেন। মেজর দ্বাদশবর্ষী এবং সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্য খানিক বাড়লেও এখনও বেশ রাজকীয় লাগে দেখতে। তাঁর শ্বদন্তও কাটা হয়নি, তবে তাঁর চেহারার প্রজ্ঞা কিংবা সদাশয় ছাপটি একটুও কমেনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য প্রাণীরা জড়ো হতে শুরু করল এবং যে যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আরাম করে বসে পড়ল। সবার আগে এলো তিনটি কুকুর : ব্লুবেল, জেসি এবং পিন্‌চার। তার পরে ঢুকল শুয়োরের দল। এরা মঞ্চের সামনের জায়গাটি দখল করল। মুরগিগুলো জানালার উঁচু কার্নিশে বসল, কবুতরেরা ডানা ঝটপটিয়ে কড়িকাঠের বর্গার ওপরে চড়ল। গরু আর ভেড়ার পাল শুয়োরদের ঠিক পেছনে বসেই জাবর কাটতে শুরু করে দিল। ঘোড়ার গাড়ির দুই জুড়ি বক্সার এবং ক্লোভার ধীরপায়ে একসঙ্গে ঢুকল। তারা তাদের রোমশ ভারী খুর সন্তর্পণে মেঝেতে ফেলছিল, যাতে করে খড়ের আড়ালে কোনো খুদে প্রাণী লুকোনো থাকলেও আঘাত না পায়। ক্লোভার স্বাস্থ্যে ভরপুর মাতৃস্বভাবী মাদী ঘোড়া। চার নম্বর বাচ্চাটার জন্মের পরে তার সুতনু ফিরে পায়নি। অন্যদিকে বক্সার বিশাল আকৃতির প্রায় আঠারো বিঘত উঁচু এবং সাধারণ মানের দুই-ঘোড়ার সমান শক্তিধর তেজী ঘোড়া। নাকের নিচে সাদা দাগটির কারণে তাকে খানিক বোকাটে দেখায়। অবশ্য বুদ্ধিমত্তার নিক্তিতেও সে প্রথমশ্রেণির নয় মোটেই। তবে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অতুল কর্মক্ষমতার কারণে সকলে তাকে সমীহ করে। এরপরে এলো সাদা রঙের ছাগল ম্যুরিয়েল এবং বেঞ্জামিন নামের গর্দভটি। বেঞ্জামিন হলো এই খামারের সবচেয়ে বয়স্ক জানোয়ার। সে প্রচণ্ড বদমেজাজী। কথা বলে ক্বচিৎ, যদিও বা বলে তাও ভারি বিদ্রুপাত্মক—যেমন ধরা যাক সে বলল, ঈশ্বর তাকে মাছি তাড়ানোর জন্য লেজ দিয়েছেন। কিন্তু এর পরেই সে যোগ করবে, এই লেজ কিংবা মাছি কোনোটিরই প্রয়োজন নেই। খামারের পশুদের মধ্যে কেবলমাত্র তার মুখেই কোনো হাসি নেই। এর কারণ জানতে চাইলে তার উত্তর—